সাহিত্যে নারী
কালে কালোত্তরে

উৎসর্গ

সুরাইয়া সুলতানা শিখা
হারিয়ে যাওয়া এক নক্ষত্র...

প্রসঙ্গকথা

প্রকৃতিতে নারী-পুরুষের গুরুত্ব সমান। কিন্তু দেখা যায় পিতৃতন্ত্র তার প্রয়োজনে নারী-পুরুষের বিভাজন রেখা নির্মাণ করেছে। সামাজিক এই বিভাজন ভেঙে সমাজের মূল স্রোতে আসতে নারীকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। একটা সময় ভাবা হতো 'মেয়েরা কবিতা লিখতে পারে না, কিংবা উপন্যাস লিখতে পারে না।' সেই ভাবনাকে ছিন্ন করে নারীরা বেরিয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আপন অস্তিত্বের জানান দিয়েছে। নারী ঔপন্যাসিক, কবি ও গল্পকারেরা তাদের রচনায় নারীর বহুমাত্রিক অন্তঃস্বরকে প্রকাশ করেছেন। সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতধারায় দাঁড়িয়ে তাঁরা নির্যাতিত এবং লড়াকু শ্রেণির নারীর জন্য কাজ করেছেন। কবিতায়, গল্পে এবং উপন্যাসে নারীর অবস্থা আর অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। লৈঙ্গিক অভিজ্ঞানের ধারণাকে কুঠারাঘাত করে প্রকাশ করছেন অপ্রকাশিত সত্যকে। নারীকে তার অবগুণ্ঠন ভেঙে বেরিয়ে আসতে রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিতে হয়। মানবীজন্মের এই আখ্যানই সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে।

সাহিত্যে লৈঙ্গিক বিভাজন অর্থাৎ নারী লেখক শব্দটি আপত্তিজনক। কেননা লেখেন স্রষ্টা, নারী কিংবা পুরুষ নন। তারপরও বর্তমান গ্রন্থে নারীর রচিত কবিতা, গল্প, উপন্যাসই আমাদের আলোচ্য। এমএ শ্রেণিতে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব পড়াতে গিয়ে নারীর রচিত সাহিত্যের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচয় হয়। আমার সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নারীর রচিত সাহিত্যের ধারাটি বোঝার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত অর্থায়নে রচিত। এজন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

কমিশন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা করতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ মোঃ রজিকুল ইসলাম সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। গবেষণার কাজ দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে শেষ করার জন্য প্রতি মুহূর্তে সঠিক পথনির্দেশ, পরামর্শ এবং উপদেশ দিয়েছেন। গবেষণা-পরিকল্পনা ও এর রূপরেখা প্রণয়নে আমাকে আরও সহযোগিতা করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মনজুর রহমান। এককথায় তাঁর অনুপ্রেরণাতেই কাজ শুরু করি। এ ছাড়া আমাকে তাগিদ এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সভাপতি ড. মোঃ রবিউল হোসেন। আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. সরওয়ার মুর্শেদ, জনাব গাজী মাহবুব মুর্শেদ, ড. মোঃ হাবিবুর রহমান (ড. রহমান হাবিব), ড. সাইফুজ্জামান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। এঁদের সকলের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। এসব গ্রন্থাগারের সজ্জন ও শুভানুধ্যায়ী কর্তৃপক্ষ-কর্মচারীদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার বাবা মোঃ রফিকুল ইসলাম, মা মনোয়ারা ইসলাম এবং শাশুড়ি আঞ্জুমান আরা মীনাকে—যাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে সহায়ক হয়েছে। বিশেষত, আব্বার নিরন্তর তাগিদ আমার কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

জীবনসঙ্গী আ. স. ম. আসাদুর রহমান—সংসারের অনেক দায় থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে আমার গবেষণাকর্ম নির্বিঘ্ন করার চেষ্টা করেছে। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেহেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নয় তাই ঋণটুকু স্বীকার করছি মাত্র। এ ছাড়া আমার আত্মজা আহসানা সুকৃতি রহমান এবং তাহসিনা সূনৃতা রহমান যাদের বঞ্চিত করে আমার এই কাজ তাদের সপ্রতিভ উপস্থিতি আমার অনুপ্রেরণাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ড. ইয়াসমিন আরা সাথী

সূচি

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারী : অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবজাগরণের অভিঘাত : নারীর স্বরূপ সন্ধান ৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যে নারীর উজ্জীবন : বহুকৌণিক দৃষ্টি ৭৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলা কবিতা নির্মাণ : নারীবাদী ভাবনায় ৭৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর ভাবনাবিশ্ব : উপন্যাস এবং ছোটোগল্পে ১৫৯

উপসংহার ২২২

গ্রন্থপঞ্জি ২২৫

ভূমিকা

পিতৃতান্ত্রিক যুক্তিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত পুরুষ নারী-পুরুষের সমতা কিংবা নারীর ব্যক্তিসত্তা কখনোই স্বীকার করে না। শারীরিক অভিব্যক্তির কারণে সমাজে নারী চিহ্নিত হয় ভিন্নভাবে। নারী অজস্র ঘাত-প্রতিঘাত এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্যে বেড়ে ওঠে। একদিকে শারীরিক অনুষঙ্গ অন্যদিকে আত্মিক চেতনার মোকাবিলায় নারী কেবলই তার প্রতিবেদনে বিনির্মাণকে অবারিত করে তোলে। নারী-অস্তিত্বের আপাত-স্বাতন্ত্র্য থেকে প্রকৃত সার্বভৌমত্বের দিকে যাত্রা সহজ হয় না। নানা ধরনের কূটাভাসের মধ্য দিয়ে চেতনার মুক্ত প্রকল্পে পৌঁছানোর চেষ্টায় সত্তার সম্ভাবনা বারবার নতুন হয়ে ওঠে। নারী সত্তার মধ্যে বারবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় জীবন সম্পর্কিত নানা বিষয়ের। বাস্তবে সামূহিক সামাজিক পরিস্থিতিতে যার কোনো উত্তর নেই, আছে শুধু প্রশ্ন থেকে প্রশ্নান্তরে যাওয়া। সমাজের নানাবিধ যন্ত্রণা এবং লাঞ্ছনার মধ্যে বেড়ে ওঠা নারী বর্তমান বিশ্বে নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তার আপন সত্তার বিকাশ ঘটাচ্ছে। পারিবারিক এবং আর্থ-সামাজিক হীনাবস্থান থেকে নিজস্বতা নির্মাণের পথে অনেকদূর এগিয়েছে। নারীর বহুমাত্রিক উন্নয়ন এবং সাহিত্যে তার আপন স্বরায়ন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে উপর্যুক্ত বিষয়ে গবেষণা আমাদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান গবেষণাকর্মে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রতিফলিত নারীর বহুমাত্রিক পরিচয়ের সন্ধান করা হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গবেষণাকর্মটির প্রথম অধ্যায়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর রূপ-রূপান্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাযাবর জীবনে নারী ছিল খাদ্য আহরণকারী। প্রাচীন যুগে এসে যাযাবর জীবনের সমাপ্তি হয়। এ যুগেই ফলমূল আহরণকারী নারীর কাছে কৃষিকাজ উদ্ভাবন সহজতর হয়। এ যুগের সমাজে যখন সম্পত্তিতে গোষ্ঠীগত স্বত্বাধিকার থেকে ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো তখন নারী ক্রমশ পুরুষের অধীন হয়ে পড়ল। বৈদিক যুগেও নারী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ছিটকে পড়ে। উপনিষদের যুগেও নারীর মূল্য মনুষ্যত্বের মানদণ্ডে স্বীকৃত হয়নি। মহাকাব্যের নারীও অবহেলিত-অসম্মানিত। সীতা, কুন্তী, সত্যবতী, দ্রৌপদী পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছে। চর্যাপদের নারীর স্বকীয়তা বিকাশের ক্ষেত্র সংকুচিত। মধ্যযুগে এসেও নারী একইভাবে শোষিত। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বদ্ধ গুমোট পরিবেশ ভাঙতে থাকে নবজাগরণ এবং নবজাগরণ উত্তরকালে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবজাগরণের অভিঘাতে নারীর স্বরূপ চিহ্নায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে রেনেসাঁস উত্তরকালে ইউরোপিয়ান নারীর অবস্থান এবং উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে ভারতীয় নারীর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'সাহিত্যে নারীর উজ্জীবন : বহুকৌণিক দৃষ্টি'। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে নারীবাদী ভাবনায় বাংলা কবিতা নির্মাণকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উপন্যাস এবং ছোটোগল্পে নারীর উজ্জীবন বহুকৌণিক দৃষ্টিতে চিহ্নায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি এই গ্রন্থটির মাধ্যমে সাহিত্যে নারীর রচনায় তার নিজস্বতার অনুসন্ধান করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারী
অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু

সভ্যতা সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী শ্রেণিশোষণের শিকার। পরিবার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদির প্রশ্নে নারী প্রত্যক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে ক্রমেই ছিটকে পড়ে। অর্থনৈতিক গুরুত্বে পিছিয়ে পড়ে। এর সাথে যুক্ত হয় সামাজিক লিঙ্গবৈষম্য। সমাজে যতই পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বের কাঠামোটি দৃঢ় হতে থাকে নারীর ক্ষমতা ততই খর্বিত হতে থাকে। সমাজ-সংসারের অন্তঃপুরে তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়। জ্ঞানের সমস্ত রকম পথ রুদ্ধ হয়। নারীর প্রতি একপেশীয় এই শাসকীয় মনোভাব যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচলিত। অথচ শারীরিক কাঠামোগত কিছু পার্থক্য এবং গর্ভধারণ বা মাতৃত্ববরণ বিষয়টি ছাড়া নারীর সাথে পুরুষের পার্থক্য কিছু নেই।[১] যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাগ্রহণ, চাকরি এবং ব্যবসায় নারী সমান পারদর্শী। অথচ নারী এখনো পারিবারিক এবং সামাজিক নিগ্রহের শিকার।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন গুহাচিত্র, উৎখননে প্রাপ্ত ফসিল এবং আদিবাসীদের যাপিতজীবনের নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জানা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন মানুষ

দলবদ্ধভাবে বসবাস করত, পশু শিকার করত এবং বন্য উদ্ভিজ্জ দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করত তখন নারী-পুরুষের বিভাজন ছিল না। আহার নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব জীবনে পুরুষ শিকার করত, নারী বন্য গাছপালা থেকে ফলমূল, শিকড়, লতাপাতা, শাক-সবজি আহরণ করত।[২] প্রাগৈতিহাসিক পুরুষ ছিল শিকারি এবং নারী ছিল খাদ্য আহরণকারী। তাই অনেকেই জীবিকার সংগ্রামে নারী ও পুরুষের ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য করে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে :

এক. পুরুষ নারীর চেয়ে শক্তিশালী, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু।

দুই. নারী-পুরুষের প্রাগৈতিহাসিক শ্রমবিভাগ চিরন্তন, শাশ্বত, স্বাভাবিক ও ঈশ্বর অনুমোদিত। এই শ্রমবিভাগ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নারী-পুরুষের স্বভাববিরুদ্ধ।[৩]

অর্থাৎ শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিকতার ধারণা প্রবলভাবে স্থিত হয়।। পুরুষের দৈহিক গঠন, এবং পুরুষ শিকারি—এ দুটি ধারণা থেকে পুরুষের উৎকর্ষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। পুরুষ কখনো একা শিকার করতে যেত না। তখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত এবং দলবদ্ধভাবে শিকার করত। নারী পুরুষের সংগ্রহ করা পশুকে খাবার উপযোগী করত।

নারী যেহেতু গর্ভধারণ করে এবং সন্তানকে স্তন পান করায় যে কারণে মায়ের সাথে সন্তানের একটি নিবিড় যোগ তৈরি হয়। নারীর পরিচয়ের সাথে সন্তানের পরিচয় জুড়ে যায়। সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হতে থাকে। প্রাগৈতিহাসিককালে ক্ষমতা-সম্পদ এসবের চেয়ে টিকে থাকার সংগ্রামটাই ছিল কঠিন। তাই নারীর ভূমিকার কারণেই সে আলাদাভাবে মূল্যায়িত হতো। পুরুষ তার মায়ের নামে আত্মপরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। এ সময় থেকেই নারী সভ্যতার ক্রমবিকাশে, মনুষ্য বসবাস উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারী তার চারপাশের উদ্ভিদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে। তাকে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারযোগ্য করেছে। নারী স্থির ও ধীশক্তির মাধ্যমে সন্তানকে বাস্তব পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে। ক্রমেই নারীকে কেন্দ্র করে